Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

প্রত্যেক যুগের চালু ধারণাগুলি সব সময়েই শাসকশ্রেণীর ধারণার প্রতিফলন। এভাবেই অর্থনীতিবিদ এবং তাঁর অর্থনীতি শাস্ত্র ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞাবাহী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন।
—কার্ল মার্কস্

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

১৯ মার্চের আহ্বান ১
দেশে বিদেশে ২
বৃহন্নলা, ছিন্ন কর ছদ্মবেশ! ৩
শোষিত মানুষের বিরোধিতা... ৪
শ্রেণি রাজনীতি ও সংযুক্ত মোর্চা ৫
কোনও আপস নয় : সুভাষচন্দ্র ৬
ফ্যাসিবাদের মুখোমুখি ৭
দুর্বার কৃষক আন্দোলন ও আর এস পি নেতৃত্ব ৮

68th Year 30th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 20th March 2021

১৭ মার্চ ১৮৮৩ লন্ডনের হাইগেট সমাধিস্থলে কার্ল মার্কসের সহযোদ্ধা অভিন্নহৃদয় বন্ধু কমরেড ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার

জন্ম : ৫ মে, ১৮১৮ মৃত্যু : ১৪ মার্চ, ১৮৮৩

গত ১৪ মার্চ বিকেল ২.৪৫ মিনিটে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সমস্ত ভাবনাচিন্তার থেকে অবসর নিয়েছেন। শুধুমাত্র দুটি মিনিট তিনি একা ছিলেন। আমরা ফিরে এসে দেখি তিনি আরামকেদারায় শান্তিতে শয়ান, কিন্তু চিরকালের জন্য।

ইউরোপ আমেরিকার বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, ক্ষতি হল ঐতিহাসিক বিজ্ঞানচর্চার। এই মহত্তম প্রাণের চিরবিদায়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা, অচিরেই বিশ্ববাসীর কাছে অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈবপ্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, সেভাবেই মার্কস মানুষের সমাজ ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। বহু তত্ত্বের ভিড়ে যে বিষয়টি সুপ্ত ছিল অর্থাৎ মানবসমাজের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য বাসস্থান পানীয় এবং পরিধানের প্রয়োজন রাজনীতি বিজ্ঞান শিল্প ও ধর্মের চেয়েও বেশি। সুতরাং উৎপাদনের প্রকরণের আশু প্রয়োজন ইতিহাসের কোনও বিশেষ পর্যায়ের অর্থনীতি বিকাশের প্রকৃত নির্ণায়ক। এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত বিশেষ রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিত্তি, ন্যায় নীতি আইন সম্পর্কিত ধারণা, শিল্প এমনকি মানুষের ধর্মীয় চেতনার বিকাশ। এরই আলোকে সমাজের বিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করেছেন মার্কস, বিপরীতটা নয়।

....

সবার উপরে মার্কস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের প্রত্যয়ঋদ্ধ আদর্শ ছিল, এপথে না হলে অন্য কোনো পথে পুঁজিবাদী সমাজ এবং এত দিন ধরে নির্মিত রাষ্ট্রিক কাঠামোটির শিকড় উপড়ে ফেলা। আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির পথ প্রশস্ত করা। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র সচেতন প্রয়াস এবং লক্ষ্য। মানবমুক্তির শর্ত নির্মাণ করাই তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডে ঋদ্ধ এবং প্রমাণিত।

১৯ মার্চের আহ্বান

শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে খেটেখাওয়া মানুষের যুক্তফ্রন্টই ফ্যাসিবাদের উত্থান রুখতে পারে

১৯৪০-এর ১৯ মার্চ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভূমিতে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণি হাওয়ায় ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রাঁচীর রামগড়ে আর এস পি'র উদ্ভব। একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের অধিবেশন, অপরদিকে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সেই ১৯ মার্চেই আপস বিরোধী সম্মেলনে বামপন্থীদের একাংশের সংগ্রামী অভিমুখ বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠেছিল। আপসবিরোধী সম্মেলনের বামগণতান্ত্রিক সংগ্রামী মঞ্চের উত্তাপ গ্রহণ করে সম্মেলন মঞ্চের অদূরেই সমবেত হয়েছিলেন এইচ এস আর এ এবং অনুশীলন অনুগামীদের একাংশ।

আপসবিরোধী সম্মেলনে সুভাষ বসুর উদাত্ত আহ্বানে ইংরেজ শাসকদের ভারত ত্যাগ এবং ভারতীয় জনগণের হাতে পূর্ণ সার্বভৌমিক স্বাধীনতা অর্পণের দাবী সহ কংগ্রেসের আপস আলোচনা ভিত্তিক রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবের বিরোধিতাই অনুপ্রাণিত করেছিল তদানীন্তন সি এস পি ভুক্ত অনুশীলন ও এইচ এস আর-এর বিপ্লবী তরুণ দলকে।

১৯২৮-২৯ এর বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাত থেকে মুক্তি পেতে ব্রিটেন সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সংকটের বোঝা উপনিবেশ সহ নিজেদের দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। আমাদের দেশে কংগ্রেসের বৃহত্তম গণমঞ্চে ধনিক শ্রেণির লোকজন সহ লিবারাল ডেমোক্রাটদের মতো ব্যক্তিদের ছাড়াও সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে প্রত্যয়ী তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত একাংশ অনুশীলন-যুগান্তর, এইচ এস আর এ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মীদেরও অনেকে ছিলেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ পুঁজিবাদী শ্রেণির প্রতিনিধিদের কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেশব্যাপী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৩১ সালে গান্ধিজি সহ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাওয়ার পর আন্দোলন থেমে গেলেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রইল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সুরাহা হল না। ভগৎ সিংদের ফাঁসির হুকুম হল ৩১ মার্চ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ বামপন্থীদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধিজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন এবং তথাকথিত ফেডেরাল কেন্দ্র ও প্রাদেশিক শাসনের সুযোগ করে দিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের সার্বিক ব্যর্থতা এবং দেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব গান্ধিজিকে বাধ্য করল ১৯৩২ সালে লবণ সত্যাগ্রহের ডাক দিতে। আবার ১৯৩৩ সালের মে মাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব পিছু হঠল। গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের আলাপ আলোচনায় বহু শ্রেণিসমন্বিত যুক্তমঞ্চের উপর উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণি এবং উচ্চমধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘকালীন রাজনীতি ও আর্থিক নীতিতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অর্থনৈতিক রূপরেখা নির্ণয়ে সুস্পষ্টভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দক্ষিণপন্থীদের এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকল। আবার বামপন্থীদের মধ্যেও জওহরলাল নেহরু প্রমুখের 'অভিজাত সমাজতন্ত্রী ধারা', সুভাষ বসুর জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আপসবিরোধী ধারা এবং কমিনটার্ন প্রভাবিত কমিউনিস্ট অংশের স্বতন্ত্র ধারা সহ সি এস পির মার্কসবাদ ঘেঁষা (বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অন্যান্য দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে একত্রে চলতে অভ্যস্ত) বহুবিধ ধারায় টানাপোড়েন কংগ্রেসের মূলধারাকে প্রভাবিত করতে থাকল।

কংগ্রেসের মূলধারার উপর প্রত্যক্ষ শক্তিশালী প্রভাব ও আদর্শগত সুদৃঢ় অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৩৪ সালেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গী শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার তাগিদে অনুশীলন সহ বিভিন্ন গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মীরা সি এস পি'র সভ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিলেন। আবার সি এস পি'র মধ্যে মার্কসবাদে প্রত্যয়ী নরেন্দ্রদেব জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মাসানি অশোক মেহতা প্রমুখ সমাজ গণতন্ত্রী ও রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখর গান্ধি নেতৃত্বের প্রতি অবিচল বিশ্বাস সি এস পিতে নবাগত বিপ্লবী তরুণদের কাছে সর্বদাই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছিল।

এছাড়া অনুশীলন, এইচ এস আর এ থেকে নবাগত সি এস পি কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদে প্রত্যয় দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও কমিনটার্নের প্রভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্টদের মধ্যে অদ্ভুত দোলায়মানতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশ্ন উত্থাপিত হত এবং শুরু থেকেই অননুসারী ধারায় কমিউনিস্ট দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের কাছে জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। কমিনটার্নের পঞ্চম ও ষষ্ঠ কংগ্রেসে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ সি এস পি সহ বামপন্থী অংশের কঠোর সমালোচনা ও অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা এবং সপ্তম কংগ্রেসে পুরো বিপরীত কৌশল গ্রহণ করে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে শর্তাধীন আত্মসমর্পণ সেই সব অনুশীলন ও এইচ এস আর-এর কর্মীদের মনে কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিকতার রণনীতি সম্বন্ধেই বীতস্পৃহ মনোভাব নিয়ে এল।

১৯৩৮ সালে প্রথমবার হরিপুরা সম্মেলনে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের শক্তির প্রতিভূরূপে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদে নির্বাচন অবশ্যই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সুস্পষ্ট জলবিভাজিকা। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর অচিরেই সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যয়ী বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি এবং মার্কসবাদে প্রত্যয়ী গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ নীতি ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে মরণপন

এরপর ৮-এর পাতায়

মন্দার বাজারে ব্যাঙ্ক ও বিমা সংস্থা বেসরকারিকরণের আসল মতলবটা কী?

জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণায় জানা গেল, দু'টি জাতীয় ব্যাঙ্ক এবং একটি বীমা সংস্থার দ্রুত বেসরকারিকরণ হবে।

মাথায় রাখতে হবে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের ভাবনাটা ২০১৪ সালে কংগ্রেসী জমানাতেই শুরু হয়েছিল এবং মোদী জমানাতে এই ভাবনা বাস্তবায়িত করার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত ব্যাঙ্ক ব্যবসার সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দখলে থাকলেও গত দু'দশকে ধার দেওয়ার নিরিখে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

২০১৪ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা কাঠামোর পুনর্মূল্যায়নের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বর্তমান ধারার বদল না হলে ২০২৫ সাল নাগাদ বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসার বিস্তার প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হবে। পুনর্মূল্যায়ন কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি বেশি লাভজনক। তুলনামূলকভাবে আমানত প্রতি বেসরকারি ব্যাঙ্কে লাভের পরিমাণ বেশি।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় অনাদায়ী ঋণের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির অনেক ভাল অবস্থায় আছে। পুনর্মূল্যায়ন কমিটির স্পষ্ট সুপারিশ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ না হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বোঝা টানতে টানতে সরকারই দেউলিয়া হয়ে পড়বে। চতুরতা ও ভন্ডামির অপূর্ব রসায়ন। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি মোক্ষম মনে হলেও, মনে রাখা প্রয়োজন সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় কিছুই করতে হয় না, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বহু শাখাই—বাণিজ্যিক অর্থে অলাভজনক হলেও সামাজিক অর্থে নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা খোলা ছাড়াও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জনস্বার্থে এমন বহু কাজ করতে হয় যেখানে, লাভের প্রশ্নটা মুখ্য বিচার্য বিষয় হয় না। স্বভাবতই বেসরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে লাভের পরিমাণ কম হওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই লাভের প্রশ্ন তুলে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের পক্ষে সওয়াল করা হচ্ছে, তখন কী ধরে নিতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আগামী দিনে ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়বে?

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্ধমান অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ অবশ্যই বেশ উদ্বেগজনক, তবে অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা, এই অনাদায়ী ঋণের বড় অংশটার জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলিই দায়ী। এই খারাপ ঋণগুলির দেওয়ার নির্দেশ অধিকাংশই আসে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উপর মহলের নেতাদের কাছ থেকে। তোষামুদে পুঁজির জমানায় বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের 'দোস্তি' তো সুবিদিত ঘটনা। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দফারফা করে—তাদের 'অলাভজনক' আখ্যা দিয়ে বেচে দেওয়ার অপচেষ্টা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথাটা এখনও বলা হয় নি। সুবিদিত ঘটনা, বর্তমানের করোনা আবহে মন্দায় আক্রান্ত সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক কম দামেই বিক্রি করবে সরকার এবং অতি মাত্রায় এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্রেতা হবে মোদী সরকারের পছন্দসই কর্পোরেট বৃহৎ সংস্থাগুলি। ব্যাঙ্ক কেনার পর ক্রেতা কর্পোরেট সংস্থাটি স্বাভাবিকভাবেই নিজের ব্যবসাতেই আমানতকারীদের টাকা খাটানোর চেষ্টা করবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের সব দায় বহন করতে হবে আমানতকারীদেরই।

প্রসঙ্গত এফ আর ডি আই নামক যে ভয়ঙ্কর বিলের কথা শোনা গিয়েছে সেই বিল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে বেসরকারি 'ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।' তবু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হলে আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কিছুটা দায়বদ্ধতা থেকেই যায়।

এই মন্দার সময়েই ব্যাঙ্ক বিক্রির আসল উদ্দেশ্য হল এই সময় যতটা কম দামে তোষামুদে পুঁজির হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ তুলে দিতে দায়বদ্ধ কর্পোরেট বান্ধব বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার—আর জনস্বার্থের প্রশ্ন? সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল আপাতত। জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ বিপুলবেগে বা উগ্রতার সঙ্গে চলতেই পারে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিলুপ্তি গণতন্ত্রের মৃত্যু নিশ্চিত করবে

চলমান চূড়ান্ত বৈষম্যের দেশ ভারতের ১৩৮ কোটি মানুষের মধ্যে কাদের প্রকৃত অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং এই মধ্যবিত্তদের আয়ের মাপকাঠিটাই বা কী? স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট ৭৩ শতাংশ সম্পদের মালিক মাত্র ১ শতাংশ মানুষ। সমাজের সব থেকে নিচুতলার মানুষের হাতে হয়েছে ২০ শতাংশ সম্পদ। অর্থাৎ ১০০ – (৭৩ + ২০) = ৭ শতাংশ সম্পদের মালিক যাঁরা, তাঁদেরই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংখ্যার নিরিখে প্রায় ১০ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই দেশে মানুষের গড় আয় মাথা পিছু ৯৮০০০ হাজার টাকা অর্থাৎ মাথা পিছু মাসিক ৮০০০ টাকা আয়ে জীবনধারনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি পূরণ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ৮০০০ এর পরিবর্তে ১৬০০০ বা ২৪০০০ টাকাতেও এই বাজারে মধ্যবিত্তদের সুষ্ঠু জীবনযাপন বেশ দুরূহ ব্যাপার।

মোটামুটি ৩ কোটি থেকে ১০ কোটি মানুষের মধ্যে ধরা যাক, ৬ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত—এঁদের মধ্যে আছেন ব্যবসায়ী, কৃষক, আইনজীবী, বিচারক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট, অভিনেতা, লেখক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন নিজেদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষরূপে পরিচয় দিতে আনন্দিত হতেন। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষগুলি সামাজিক জীবন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এঁরা সংসদ-বিধানসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন। স্থানীয় পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ডের নির্মাণ নির্বাচন, সমবায় সমিতি, ক্রীড়া জগতে, ক্লাব ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যেই পাওয়া যেত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্য শিল্পীদের যাঁরা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্কেও অংশগ্রহণ করতেন।

একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরাই মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সমাজজীবনে মহতী প্রেরণার উৎস ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে বৌদ্ধিক সম্পর্কে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই মধ্যবিত্তরা বা ভদ্রলোকের মতামত ক্ষমতাসীনদের কাছেও বিশেষ মর্যাদা পেত, সাহিত্যে নাটকে মধ্যবিত্তদের ভাবনা চিন্তাগুলির প্রতিফলন ঘটত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই রাজনীতিও সমৃদ্ধ হত।

ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বহু বিখ্যাত মানুষ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই উঠে এসেছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের জীবনবোধের সঙ্গে জড়িত যুক্তিবাদী মনন সহমর্মিতা, ন্যায় অন্যায় বিচার বোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর বিশেষ কদরও ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে সমাজজীবনের অমূল্য সম্পদ মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাস্তবে কেবলমাত্র অর্থনীতিবিদদের কাছেই অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাগের তাত্ত্বিক প্রয়োজনেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকৃত, অন্যত্র নয়। সামাজিক জীবনের সর্বত্র এক ধরনের পুরো সময়ের রাজনীতিকরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিম্ন ও মধ্য মেধার মানুষরাই বৌদ্ধিক সম্পদে সম্পদশালী মধ্যবিত্তদের স্থান গ্রহণ করেছেন সমাজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। আজ টাকার বিনিময়ে সব কিছুই বেচা কেনা করা যায় বলে বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি সবই হয়ে পড়েছে নিম্নমানের।

পয়সাওয়ালা ইতর, নিম্ন মেধার মানুষদের প্রাবল্যে মধ্যবিত্তদের কোণঠাসা অবস্থা। এরই প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্তরাও শ্রেণি হিসাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির প্রতি ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে। ১০০ দিনেরও বেশি সময় গাজিপুর সিংঘু-টিকরিতে অবস্থানরত কৃষকদের প্রতি মধ্যবিত্তদের নিস্পৃহ মানসিকতা যন্ত্রণাদায়ক। জে এন ইউ - এ এম ইউ ছাত্রদের উপর পুলিশী অত্যাচার এদের আলোড়িত করে না। শাহিনবাগ বা অন্যত্র সংবিধান সংশোধন বিরোধী আন্দোলনের প্রতি হয়ত এই মধ্যবিত্তরা কোনও সহমর্মিতা পোষন করেন না। করোনা অতিমারির সময় মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে হাজার হাজার কর্মচ্যুত পরিযায়ী শ্রমিকদের সপরিবারে শত শত মাইলের পদযাত্রার নির্মম হৃদয় বিদরক দৃশ্যেও আজকের মধ্যবিত্তরা নির্বিকার, স্বাভাবিক প্রতিবাদী মানসিকতার আগুনটাই আজ নির্বাপিত। সমাজের সক্রিয় কর্মী, সাহিত্যিক, শিল্পীদের গ্রেপ্তার, হয়রানি ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মধ্যবিত্তশ্রেণির কণ্ঠস্বর আর সোচ্চার নয়। নিস্পৃহ মধ্যবিত্তশ্রেণি বা বিলুপ্তপ্রায় মধ্যবিত্তশ্রেণি সুস্থ সমাজের কাছে নিঃসন্দেহে অশনি সংকেত।

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আশঙ্কা হয়, নির্বাচনের পরেই জনগণের রায় উল্টে দিয়ে ঘোড়া কেনাবেচার খেলায় শত শত কোটি টাকার বিনিয়োগ সমস্ত জীবনকে পঙ্কিল করে তুলবে, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা হবে নীরব দর্শকের। গল্পের তিন বাঁদরের মতই, যারা কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে পায় না, চোখেও দেখতে পায় না। আশঙ্কা নয় বাস্তব সত্য যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিলুপ্তি গণতন্ত্রের মৃত্যুকে নিশ্চিত করবে।

নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বেশ ভাল সম্পর্কই ছিল। কিন্তু হোয়াই হাউসে পালা বদলের পর মস্কো-ওয়াশিংটন সম্পর্ক দ্রুত প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পুতিনকে একজন 'খুনি' বলেই অভিহিত করেছেন। বাইডেনের এমন মন্তব্যে বিশেষ ক্ষুব্ধ পুতিন পাল্টা তোপ দেগেছেন। পুতিন বাইডেন সম্পর্কে বলেছেন একজন খুনিই আর এক খুনিকে চিনতে পারে।

প্রসঙ্গটা ছিল রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সেই নাভালনিকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা। অভিযোগের তীর ছিল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দিকেই। এই প্রসঙ্গেই জো বাইডেন বলেন, নাভালনিকে হত্যার চেষ্টার জন্য পুতিনই দায়ী। পুতিন একজন খুনি। বাইডেনের মন্তব্যে রুশ প্রতিক্রিয়া হয়েছে রাশিয়ায় ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ অত্যন্ত কড়া সুরে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মন্তব্য অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং বোঝা যাচ্ছে বাইডেন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী নন। এরপর রাশিয়াও যে পথে চলা উচিত সেই পথেই চলবে।

এক নজরে করোনা সমাচার

সারা দেশে এক দিনে ৩৬ হাজার মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। সারা দেশে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। প্রশাসন বিশেষ উদ্বিগ্ন, বিশেষত আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে। ভারতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয়ার্ধের লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। সারা দেশে এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ করোনা রোগীর সংখ্যা আড়াই লক্ষেলও বেশি। চারশোরও বেশি রোগীর শরীরে ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিলের করোনা স্ট্রেনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ১৮ মার্চ সারা দিনে মহারাষ্ট্রেই ২৫,৮৩৩ জন বাসিন্দার দেহে করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুনা, নাগপুর, মুম্বাই ছাড়াও নাসিক, অরঙ্গাবাদ, নান্দেদ, অমরাবতী, আকোলাতেই বাড়ছে সংক্রমণ। এদিকে মহারাষ্টর ছাড়া পঞ্জাবেও পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। পঞ্জাবের লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, জলন্ধর অমৃতসর সহ ন'টি জেলায় রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফু জারি করা হয়েছে।

এদিকে আন্দামানে এক বিশেষ ধরনের অনুজীবীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার নাম ক্যানডিডা বা সি-অরিস। আন্দামানের সমুদ্রতট থেকে এই সি-অরিস নামের 'সুপারবাগ' সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভয়ঙ্কর এই সুপার বাগের আক্রমণে এক বছরেই ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই মুহূর্তে সি অবিসনের চরিত্র ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যে কোনও ধরনের ওষুধের বিরুদ্ধে এই সুপার বাগ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

লোকসভায় করোনায় সারা দেশে কর্মচ্যুতদের মোট সংখ্যা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বা তার দল বলছে চাকরি হবে। কোভিডের ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকরি যাওয়া নিয়ে আঙ্গুল তুললেন রাহুল গান্ধী।

লোকসভায় প্রদত্ত শ্রম মন্ত্রকের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে ২০২০-এ এপ্রিল থেকে ২০২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৭১ লক্ষ কর্মীর প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ৭১ লক্ষ কর্মী মোট কর্মচ্যুত হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও বহু মানুষের চাকরি গিয়েছে। মনে হয় যেন কেন্দ্রীয় সরকারের ''চাকরি হটাও'' অভিযান চলছে। শুধুমাত্র উন্নত দেশেই নয়, মধ্য বা নিম্ন আয়ের বহু দেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য প্রকার। এই দেশগুলি কল্যাণকামী দেশের মডেল মাথায় রেখেই কর্মরত মানুষদের কাজ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে। দেশের অর্থনীতিকে অবনমনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে চলেছেন। পুঁজিপতি বন্ধুদের সরকার ভারতে এমন ব্যবস্থার কথা এখন কল্পনাও করতে পারছেন না।

সংযুক্ত মোর্চাকে জেতাও, তৃণমূলকে তাড়াও, বিজেপিকে ভাগাও : বৃহন্নলা, ছিন্ন কর ছদ্মবেশ!

তুষার চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচন এই রাজ্য ও রাজ্যবাসীদের জন্য যেমন অসীম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সারা দেশের কাছেও এর তাৎপর্য অপরিসীম। বিশেষত তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন দিল্লী সীমান্ত থেকে আজ ক্রমশ দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করছে—তাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সহ, আসাম, কেরল, তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভা নির্বাচনের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জাতীয় প্রেক্ষিতের ঘনিষ্ঠ সমাপতনের ফলে, কিছু সমস্যাও তৈরী হয়েছে। বিধানসভার নির্বাচন হয় প্রধানত রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের কাজের ভিত্তিতে, রাজ্যের চাহিদা ও পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে। আর লোকসভার নির্বাচনে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের হিসেব নিকেশ করেন মতদাতারা।

এ বারের পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে কেউ কেউ রাজ্যের চাইতে দেশের হিসেবনিকেশের রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন। এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস নিজের যাবতীয় কু-কীর্তি ও স্বৈরাচারকে ধাক্কা দিতে এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী মোদির বিজেপি সরকারও এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। দেশিবিদেশি কর্পোরেট এবং তাদের অনুদানপুষ্ট এনজিও এবং কিছু নকশালপন্থী গোষ্ঠী ও দলের যোগসাজসে এই বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। অনেকে অসেচনতভাবেও সেই বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে—এই নির্বাচন কিসের ভিত্তিতে, ভোটারদের কি করতে হবে, এ সব নিয়ে দোটানায় জড়িয়ে পড়ছেন। এখানে সেই বিষয়ের ওপরে খানিক আলোকপাত করতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তি যে প্রধান রাজনৈতিক বিরোধীশক্তি সেই বাস্তব সত্য ২০১১ সালে গদিতে বসার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ক্রমাগত অস্বীকার করে আসছে। বামপন্থীদের বেশিরভাগ পার্টি অফিস, ইউনিয়ন অফিস দখল করা হয়েছে তাই নয়, তাদের নেতাকর্মী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। নামানো হয়েছে নানা অত্যাচার। তৃণমূলের প্রত্যক্ষ সহায়তায়, বিজেপি ও আর এস এসকেও সেই সময় থেকে এই কাজে লাগানো হয়। বামপন্থীদের চিরতরে নিকেশ করা, নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বিজেপি হয়ে উঠেছিল তৃণমূলের বি-টিম। সেই সুযোগ লুফে নিয়েই—তেমন কোনো জনভিত্তি ছাড়াই বিজেপি এই রাজ্যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, দ্রুত নিজের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। সেই বৃদ্ধি যে কতটা, আর তার পরিণাম কি হতে পারে, মেধাবী তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেও তা প্রথমে আন্দাজ করতে পারেন নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, ব্যাপকভাবে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তৃণমূল নিজের কবরে পেরেক ঠোকার কাজটা নিজেই করে ফেলে।

এর ফল ঘটতে বেশি দেরী হয়নি। বিগত লোকসভা নির্বাচনে—তৃণমূলের কুশাসনের বিরুদ্ধে গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষদের ক্ষোভ সামাজিকভাবে একত্রিত হয়ে বিজেপিকে প্রায় অর্ধেক আসনে জিতিয়ে দেয়। সাধারণ ভোটদাতারা, যারা কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ভোট দিতেন—তারাও অনেকেই তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেন। তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক দল হবার ফলে, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে যে তার তেমন কোনো ভূমিকা থাকবে না সেটাও ভোটদাতারা মাথায় রেখেছিলেন। কিন্তু, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া বা সতর্ক হবার বদলে—তৃণমূল তার স্বৈরাচার ও তোলাবাজি সহ যাবতীয় দুর্নীতি তার পরেও আরও বাড়িয়ে তুলল। যার ফলে তৃণমূল এখন এই রাজ্যে প্রবল জনরোষের মুখে পড়ে ভেতরে ভেতরে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন, গুন্ডাগিরি ও অর্থের বিনিময়ে এ রাজ্যের ক্লাবগুলিকে হাতে এনে তৃণমূল এখন ক্ষমতায় টিকে আছে।

যাবতীয় দমনপীড়ন ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ কিন্তু এই রাজ্যে এখনও প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে বিরাজ করছে। তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ আদর্শহীন, মমতার ভাষায়—যখন যেমন কৌশল চলে এমন এক পার্টি। কোনো আদর্শগত অবস্থান তাই এই দলের নেই। হিন্দুত্ববাদী বিজেপির রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত্তিও কিন্তু এখনো এই রাজ্যে বামপন্থীদের তুলনায় নিতান্ত দুর্বল। তাছাড়া, এই রাজ্যে তৃণমূল যতটা জনসমর্থন হারিয়েছে বিজেপি তা এখনো নিজের কোলে টানতে পারেনি। অথচ, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও লুঠের টাকা ব্যবহার করে, তৃণমূল ও বিজেপি দ্বিপাক্ষিক যোগসাজসে, এই রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্বই যেন প্রধান, এমন একটা দুরভিসন্ধিমূলক তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। তৃণমূলের প্রসাদজীবী কিছু নকশালপন্থী ফেরিওয়ালারাও এই তত্ত্ব ফেরি করছেন। সরাসরি তৃণমূলকে ভোট দাও না বলে তারা বলছেন যে, বিজেপিকে ভোট দিও না। যদিও, আলোচনায় ও বিস্তারিতভাবে কথাবার্তায় এরা বাম ও কংগ্রেস সহ এ রাজ্যের প্রতারিত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষদের জোটকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেও রাজি নন। রাজ্যের অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে গঠিত এই প্রকৃত ফ্যাসিবিরোধী জোটকে এলেবেলে হিসেবে আরও প্রান্তে ঠেলে দেবার অপচেষ্টায় "অতিবাম" ও সাবঅলটার্ন পণ্ডিতদের এই একাংশ যেন একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

এই পণ্ডিত বা স্বঘোষিত বিপ্লবীরা রাজ্যে বিজেপি'র প্রায় একচেটিয়া নেতাকর্মী সাপ্লায়ার তৃণমূলের সাত খুন মাপ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু বামেদের সংযুক্ত মোর্চার ছিদ্র খুঁজতে এরাই একেবারে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তাই, এই আলোচনার শিরোনামে আসন্ন নির্বাচনে সংকটদীর্ণ এই রাজ্যের চরম নিরাপত্তাহীনতায় বাস করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতারিত লুণ্ঠিত সাধারণ নাগরিকরা কি করতে পারে তা একেবারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এই রাজ্যে এই মুহূর্তে বিজেপিকে আটকাতে, প্রতিহত করতে পারে সংযুক্ত মোর্চার সম্মিলিত শক্তি। তারাই এই রাজ্যের ফ্যাসিবিরোধী ও বিজেপি বিরোধী যুক্তমঞ্চ। ক্ষমতা থেকে তৃণমূলের সমূল উৎপাটন এই রাজ্যে বিজেপিকে শক্তিহীন করার, আটকে দেবার, প্রধান উপায়।

তৃণমূল ও বিজেপি'র ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতাকে শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব বা সম্পর্ক বলে ভাবাটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। নকশালপন্থীদের একাংশ সেই ভুল যুক্তিকে এগিয়ে দিয়ে রাজ্যের বামপন্থী শক্তিকে দুর্বল করার কাজে, যে কারণেই হোক, নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। এই রাজ্যের সৎ রাজনৈতিক কর্মীদের যদিও কোনমতেই সেই ভুল হবার কথা নয়। দেখতে পাচ্ছি, কোথাও কোথাও ছোট রাক্ষস, বড় রাক্ষসের একটা উপমাও তারা ব্যবহার করছেন।

আপনাদের এইসব কথা বোঝাতে এলে আপনারা তাদের বলুন, ছোট রাক্ষস বড় রাক্ষসকে আটকাবে না, বরং, যে কোনো সময়ে রাক্ষসদের এক সুখী পরিবারই গড়ে তুলবে। এরই প্রথমপর্ব আমরা গত দশ বছরে দেখেছি। রাক্ষস দিয়ে রাক্ষস আটকানোর তত্ত্বে তারা নিজেরা যতই নাচানাচি করুন—মানুষ তাদের কথায় তেমন কান দিচ্ছেন না, এটাই ভরসার কথা।

শাসকদলের দুর্বৃত্তরা অবশ্য তৃণমূল-বিজেপি প্রধানদ্বন্দ্বের আজব তত্ত্বের ধার ধারে না। তারা অনেক বেশি বস্তুবাদী। তারা দ্রুত বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। তৃণমূলের তোলাবাজি, সরকারি বা জনসম্পদ লুঠপাট ও নির্বিচারে ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাসে মানুষ তিতিবিরক্ত। ভোটদানের অধিকারটাও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই তারাও তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার সুযোগ খুঁজছেন। তৃণমূল যে এ রাজ্যে বিজেপি'র প্রধান সহায়ক শক্তি বা ঠিকাদার তা তৃণমূল-বিজেপি নেতাকর্মীদের অবিরাম ঘন ঘন দলবদলের, আসা-যাওয়ার মধ্যেই ধরা পড়ছে। যাঁরা সচেতন ও ভুক্তভোগী, তাঁরা এই নিদর্শন দেখে ছলনা বুঝে ফেলছেন।

তৃণমূল বিজেপি বাকযুদ্ধ যে প্রধান দ্বন্দ্ব নয়, বরং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, গ্রামের নিরক্ষর মানুষের কাছেও আজ তা স্পষ্ট। এরাই, দ্রুত সমবেত হচ্ছেন সংযুক্ত মোর্চার পতাকাতলে। ব্রিগেডে মোর্চার সভার বিপুল ঐতিহাসিক জনসমাগম তার প্রমাণ। তৃণমূল ও বিজেপির সভা যার ধার কাছেও আসতে পারে নি। অথচ, তা সত্ত্বেও—সংযুক্ত মোর্চাকে গণনায় আনতে যাদের প্রবল অনীহা—তাদের টিকি ফ্যাসিবিরোধী আবেগে নয়—অন্য কোনো স্বার্থের কাছে নিশ্চিত ভাবেই বাধা আছে।

ভারতের রাজনীতিতে নির্বাচনকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো উপায় নেই। ভারতের "গণতন্ত্র" এককথায় বলতে গেলে নির্বাচন-সর্বস্ব। দেশে সমাজ পরিসরে, ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক অর্থনীতিতে গণতন্ত্র যত দুর্বল ও বিকৃত হয়ে পড়ছে, ততই নির্বাচন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব আরও বাড়ছে। দেশটি ক্রমশ নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের চেহারা নিচ্ছে। কেবলমাত্র ভারত নয়, বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্বে, বিশ্বের অনেক দেশেই এমনটা এখন ঘটছে। অর্থনীতির সংকটে, গণতন্ত্রের প্রসারের জায়গায়, ঘটছে গণতন্ত্রের সংকোচন।

সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের কিছু পণ্ডিত ২০১৪ সালে আজকের বিশ্বে গণতন্ত্রের বৈচিত্র বা পরিবর্তনের চর্চার জন্য V-DEM INSTITUTE নামে এক ছোটো কেন্দ্র বা সেন্টার তৈরি করেন। তারাই গণতন্ত্র মাপার কাজটা করছেন। ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে একটি বার্ষিক রিপোর্টে সেই ফলাফল জানানো। এই সংস্থার, সদ্য প্রকাশিত ২০২০ সালের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে ভারত একটি নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃতি অর্জন করেছে। অর্থাৎ, দেশের নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাকে স্বৈরাচারীর মতো ব্যবহার করছেন। বিরোধী পক্ষ বা জনতার মতামতকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ওপর নিজেদের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই খবর, আমাদের সংবাদ মাধ্যমেও ছাপানো হয়েছে। এর থেকে মুক্তির উপায় কি—সেটাই লাখটাকার প্রশ্ন। একটি আদর্শভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সরকার—যা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় মদমত্ত নয়—বরং জনমতের প্রতি সতত দায়বদ্ধ থাকবে, ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ করবে, ঘটাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সেটাই গণতন্ত্রের দাবি। বামপন্থী, কংগ্রেস ও সংযুক্ত মোর্চা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং নরেন্দ্র মোদী ও সংঘপরিবারের মতো মমতা নিজের বুদ্ধি, মত ও কথায় শেষকথা বলে দাবি করেন। জনতার মধ্যে থেকেও কেউ প্রশ্ন করলে—তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রকাশ্যে ক্রীতদাসের মতো হুকুম তামিল করতে বাধ্য করেন। কোনো আইনকানুন—নিজেরাই মানেন না। নির্বাচনকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি, তাই ঘোষিত ও প্রমাণিত স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন নেতানেত্রীদের পরাস্ত করাও তাই অত্যাবশ্যকীয়।

এবার আরেকটু জটিল একটি প্রসঙ্গ, অল্পের ওপর টেনে এনে এই আলোচনা শেষ করব। আমরা সবাই জানি যে সুইডেনের উক্ত V-DEM সংস্থাটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার চান। কিন্তু কেন? উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আজকের দিনে প্রধান উদ্দেশ্য হলো পুঁজি ও পণ্যের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা। সেটাই তারা করছেন। এই কারণেই তাদের অনুদান যোগান হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, মোদী সরকার তো ঠিক সেটাই চাইছেন। অবাধ লগ্নির প্রসার। তাই তো? তিন কৃষি আইন তো ঠিক সেই লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। তাহলে, এই সংস্থা, এবং অস্ট্রেলিয়া, কানাডার মতো দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও ইউরোপের উদারগণতন্ত্রের শিবিরের অনেকেই মোদী সরকারের সমালোচনা করছেন কেন, এই কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করছেন কেন? এই সমালোচনা কি শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি প্রেম থেকে প্রসূত? চিন্তা করে দেখুন, ভারতে নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ তো এই নতুন নয়। তার পরাকাষ্ঠা তো দেখিয়ে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী। না গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দায় নয়—প্রাথমিকভাবে এদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। না হলে এরা এতটা সরব হতেন কিনা তাতে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

বর্তমান সরকারের পলায়নমুখী বিদেশি লগ্নি জোর করে আটকে রাখার প্রবণতা ও বিদেশি বহুজাতিকদের তুলনায় আম্বানি ও আদানিদের বেশি সুবিধে পাইয়ে দেওয়ায় এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আশঙ্কিত। এটা ঠিক, যে কৃষক আন্দোলন লড়ছে দেশের কৃষকদের স্বার্থে ও দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে। কিন্তু, এই সব বিদেশি রাষ্ট্রনায়ক ও বিদেশি গণতন্ত্র-মাপক সংস্থা লড়ছে বিদেশি লগ্নির নিরাপত্তার স্বার্থে। বিদেশি কৃষিবাণিজ্য প্রভুদের স্বার্থে। আর, এদের অনুদানপুষ্ট এনজিওরাও তাদের স্বার্থে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, নিয়েছে সরব ভূমিকা।

আজকের বাস্তবতা হলো, নরেন্দ্র মোদীর ভারত এখন আর বিদেশি

এরপর ৮-এর পাতায়

শোষিত মানুষের একনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে নতুন সমাজ

ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য

বাল্যকালে ইতিহাসের পাতায় ''মাৎস্যন্যায়'' নিয়ে পড়তে গিয়ে বারবার মনে হতো, আচ্ছা একদিন যদি এমন হয় যে, ছোট ছোট মাছের দল মনে করল, সর্বক্ষণ এইভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, বেশ কিছু সংখ্যক নিশ্চিত মৃত্যুর কথা মেনে নিয়েও, যদি একসাথে সকলে মিলে বড় বড় মাছেদের পেটে ঢুকতে শুরু করে, তাহলে বিষয়টা এমনও হতে পারে, পেট ফেটে বড় বড় মাছেদের মৃত্যু অনিবার্য।

''মাৎস্যন্যায়'' কথাটির সাথে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। বিষয়টি আর কিছু নয়, বড় বড় মাছেরা যখন ইচ্ছে ছোট ছোট মাছেদের গিলে খেয়ে ফেলে।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে মাৎস্যন্যায় প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি, যদিও সকলেরই বিষয়টি জানেন বলেই অনুমান।

''মাৎস্যন্যায়'' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ''মাৎস্যন্যায়ম'' থেকে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'মাৎস্যন্যায়ম'' সম্পর্কে যেরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হল, যখন দণ্ডদানের আইন স্থগিত বা অকার্যকর থাকে, তখন এমন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা, মাছের রাজ্য সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনের মধ্যে পরিস্ফুট। কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবর্তমানে সবল দুর্বলকে গ্রাস করবেই। উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা শশাঙ্কের (৬০০-৬২৫ খ্রি.) মৃত্যুর পর থেকে পাল রাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছি। পাল বংশের পূর্ববর্তী সময়ের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ''মাৎস্যন্যায়'' বলে খ্যাত। এই সময় সামন্ত প্রভুরা প্রত্যেকেই ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম। তারাই নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন প্রধানগণ প্রাধান্য বিস্তারের তাগিদে সর্বদাই নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষি হয়েছিল। আইন শৃঙ্খলা বলতে তখন অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। বারংবার বৈদেশিক আক্রমণে রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং তাতে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সে সময় দৈহিক শক্তির প্রাধান্যে দেশজুড়ে চলছিল অবাধ্য শক্তির উত্তেজনা, অর্থাৎ শক্তিমানেরা দুর্বলদের ওপর নিরন্তর নৈরাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। জনগণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। রৌপ্যমুদ্রার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি বাংলার তদানীন্তন সময়ের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই অর্থনীতি বিধ্বস্ত।

আলোচনার সুবিধার্থে, আর দুটি ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি হলো, বিশ্বের ইতিহাসে সম্রাট চেঙ্গিস খান একজন ভয়ঙ্কর যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনেকখানি অংশ দখল করেছিলেন নিজের নেতৃত্বগুণে। তাঁকে মঙ্গোল জাতির পিতা বলা হতো। তবে, বিশ্বের কিছু অঞ্চলে চেঙ্গিস খান অতি নির্মম ও রক্তপিপাসু মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। বীভৎস ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিটি আক্রমণ ও বিজয় পরিচালিত হতো। একের পর এক জায়গা দখল করতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়েছিল তাঁর আক্রমণ। কয়েক কোটি প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। কোনো দেশ দখল করার পর সেই পরাজিত দেশের সম্রাটদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখা হতো না, এমনকি শিশুরাও রেহাই পায়নি তার থেকে।

'চেঙ্গিস খান' বা সারা পৃথিবীর শাসনকর্তা আসলে উপাধি। আসল নাম ছিল, তেমুজিন। যদিও নৃশংসতার মধ্যে দিয়ে নানা কাহিনী রচিত হয়েছে, তবুও একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচিতি পাওয়া যায়। নিজের ধর্ম শামানে যে রকম বিশ্বাস ছিল, তেমনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি ছিলেন সহনশীল। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল সব ধর্মকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোনো ধর্মকেই অন্য ধর্মের উপর স্থান দেওয়া যাবে না, এমনকি নিজের ধর্ম শামানকেও না। তিনি যেকোনো বিষয়ে পারদর্শী জ্ঞানীগুণী, ভাস্কর, চিত্রকর, প্রকৌশলী ব্যক্তিদের সম্মানের চোখে দেখতেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, পারস্যের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সেলজুক সাম্রাজ্যের উজির ছিলেন আবু আলী আল-হাসান আল তুসি নিজামুল মুলক। অল্প সময়ের জন্য সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। সাম্রাজ্যের সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেশ নজির সৃষ্টি করেছিলেন। যার ফলে ''নিজামুল মূলক'' অর্থাৎ রাজ্যের শৃঙ্খলা উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ইসফাহান থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ইনি একটি বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন বলে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়, তা হলো, সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীব হচ্ছে, অত্যাচারী শাসক ও তোষামোদকারী পার্শ্বচর।

এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ পাঠকদের জন্য উল্লেখ করতে চাই, যা কিনা কনফুসিয়াসের বিখ্যাত উক্তি হিসেবে পরিচিত, তা হলো, অত্যাচারী শাসক হিংস্র বাঘের থেকেও ভয়ঙ্কর।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে বারংবার ইতিহাসের এক ধরনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বিভিন্ন সময়েই উপরোক্ত বিবরণের সঙ্গে সাযুজ্য পূর্ণ অনেক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সাম্প্রতিক কালের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যদি খোলা মনে বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলেও উপরোক্ত বিবরণের সাথে মিল দেখতে পাব। এখনও এমন কিছু শাসকের সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁরা নিজ শ্রেণি স্বার্থে অত্যাচার করলেও বেশকিছু বিষয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে থাকেন। এদের সম্পর্কে মোহ ভাঙ্গতে সময় লাগে। আবার এমন অনেক শাসক পাওয়া যাবে যাঁরা, অমানবিক, অত্যাচারী, নৃশংস। নিজেদের স্বার্থে যেকোনো ধরনের নাশকতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হন না। দুর্জনের চলার পথ দুর্বৃত্তায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁরা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে, বিভেদের ক্ষত সৃষ্টি করে, সমাজে অস্থিরতা, হিংসাবিদ্বেষ, অমানবিক আচরণ করে নিজেদের স্বার্থে পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে সচেষ্ট হয়। পেশী ও আর্থিক শক্তির প্রাধান্যে রাষ্ট্র জুড়ে চলে অবাধ্য শক্তির উত্তেজনা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণে আজ অস্থিরতা বিরাজ করছে। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা আজ দুরূহ। সকলের জন্য সরকারিভাবে শিক্ষা ও শিক্ষান্তে কর্মসংস্থান আজ সুদূরপ্রসারী কল্পনামাত্র। এমনকি, সরকার কর্মসংস্থান থেকে কর্মসংকোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বেশি উৎসাহী। নিজেদের স্বার্থে ও ব্যর্থতা ঢাকতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সওয়াল করা শুরু হয়েছে। কিন্তু একসময় মানুষের কল্যাণে মানুষের আন্দোলনের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সরকারি অধিগ্রহণ হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্র এক সময় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে এসেছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলা যায়, কোন কিছু গড়ে তুলতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন লগ্নি করার প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অর্থ অনুন্নত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার কাছে থাকে না। তাছাড়া কোন কিছু সঠিকভাবে তৈরির জন্য যে সময় প্রয়োজন, ততদিন মূলধন থেকে সেই অর্থে লাভ কিছুই হয় না। বরঞ্চ দেশের সামগ্রিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে তাই দিয়ে সংস্থা তৈরি করে নিজেদের দখলে রাখতে পারলে সেটা অনেক বেশি ঝুঁকিহীন। কিন্তু বর্তমানে সমস্ত বিষয় থেকে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে, অর্থাৎ নিয়োগ, কর্মপদ্ধতি, বেতন কাঠামো, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যাতে শাসকের কোনরকম বিড়ম্বনায় না পড়তে হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে, খুবই সুকৌশলে সুক্ষ্মভাবে কাজ শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে, কর্মীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, জনজীবনে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বেসরকারিকরণের দিকে সুচারুভাবে মানুষের মনকে চালনা করার অপচেষ্টায় রত রাষ্ট্রীয় সরকার। সব কিছু থেকেই সরকার নিজেদের দায়বদ্ধতা ঝেড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। জবাবদিহির কোনো দায় থেকে বোঁচতে। রেল, বীমা, কয়লা, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, উড়ান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বত্র একই পদ্ধতিতে বেসরকারি মালিকানায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাদের চিন্তায় এগুলো বেসরকারিকরণ হয়ে গেলে এগুলোর পরিচালনা সম্পর্কে (কর্মপদ্ধতি, কর্মী নিয়োগ বা কর্মী ছাঁটাই) সরকারকে আর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না।

পরিকল্পনার স্তর এতটাই উচ্চমার্গের যে, সকলের কাছে সেটা বোধগম্য হওয়াই দুরূহ এবং যখন তার ফল অনুভব করা যায় তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এর বিষবৎ ফলাফল থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। সরকারি ব্যবস্থাপনায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ, বেসরকারিকরণ হলে মানুষের সমস্ত সমস্যার সুরাহা হবে এই প্রচার লাগাতার চালানোর জন্য কিছু তোষামোদকারী পার্শ্বচরের ওপর দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সত্যের অপলাপ করে, নানাবিধ চাতুরীর ও বিষয়ে অন্ধকার দিক সম্পর্কে অবহিত না করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। নিজের কুকর্ম অন্যের ওপর বা পূর্ববর্তী শাসকদের ওপর চাপিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কিভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পাওয়া যায়? বিভিন্ন সময়ে আমরা লক্ষ করেছি, ব্যাঙ্কের কোষাগার থেকে সেই অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু সময় সেই অর্থ পুনরায় ফেরত এলেও অনেক সময় তা না দেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়।

ইতিহাসের নিয়মেই সকল মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সেই সমস্ত মানুষ সকলের হিতে শাসকের দূরভিসন্ধির কথা প্রকাশ্যে আনতে সচেষ্ট হয়। সেই উষ্মাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শাসক তখন নানাভাবে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই কাজে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং বল প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু অত্যাচার ইতিহাসে শেষ কথা বলে না। অত্যাচারিত হতে হতে মানুষ যখন তাঁর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায় না, যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন সে নিজেকে মানসিক ভাবে বলিষ্ঠ করার চেষ্টা করে এবং সমমনোভাবাপন্ন গন্ডিতে নিজেকে যুক্ত করে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাগিদে সংগঠিত হয়। এর ফলে বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে তা, জেনে বুঝেই মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হয়। এই ঐক্যবদ্ধ মানুষের একনিষ্ঠ সচেতন বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে নতুন সমাজ।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান

আজ ১৯ মার্চ, আমাদের প্রিয় রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। দেশের প্রায় সর্বত্র এই বিশেষ দিনটি আমাদের সহযোদ্ধা সাথীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করছেন। আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

আমরা নির্দিষ্ট ভাবে জানি যে, একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষের কাছে সর্বপ্রধান কর্তব্য বর্তমান সময়ের কর্পোরেট রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার যথাযথ মোকাবিলা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এমন কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জনবিরোধী অপকর্ম চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। নানা ধরনের আপাত বিরোধিতা থাকলেও বস্তুত সারাদেশের ক্ষেত্রে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি'র সঙ্গে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় উভয় দলই এক পংক্তিভুক্ত। এটা এই রাজ্যের বিশেষ চারিত্রবৈশিষ্ট্য। অন্যান্য রাজ্যে তৃণমূল অস্তিত্বহীন। আমাদের দলের অনন্য গুণযোগ্যতাসম্পন্ন স্থপয়িতাদের এমন বিসদৃশ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। সেইসকল শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের এমন এক ভয়ঙ্কর অবস্থা বাস্তবে দেখতে হয়নি।

বর্তমানে আর এস পি'র কাছে সর্বপ্রধান সমস্যা চরম দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত হয়ে চলেছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা চরমভাবে আক্রান্ত। প্রতিদিন প্রতিরাতে এদের বিরুদ্ধে অমানবিক আক্রমণ শানিত করে চলেছে আদানি আম্বানির উচ্ছিষ্ট ভোগ করা মোদি সরকার। আমাদের একান্ত এবং তাৎক্ষণিক কর্তব্য এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্যক মোকাবিলা। বর্তমান সরকার উদ্বেগজনক উগ্রতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংকটগ্রস্ত আগ্রাসী ধনবাদের নির্দেশ অনুযায়ী নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলি অতি উগ্রতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করে চলেছে। ফ্যাসিবাদী কায়দায় চরম আক্রমণ শানিত হচ্ছে। এমন নৃশংস পথে চলার জন্য শ্রমিক, কৃষক, নারী সমাজ ছাত্র যুব সকলেরই গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সমগ্র দেশ জুড়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এই অতি বিরূপ অবস্থা থেকে দেশের মানুষের পরিত্রাণ জরুরি। নূন্যতম সাংবিধানিক অধিকারগুলি হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। মোদি সরকারের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের প্রকল্পকে প্রতিহত করতেই হবে। এমন বিষাক্ত পরিবেশ দেশের সামূহিক সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমাদের দল মনে করেছিল, অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি পূরণ করতে করতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হবে। এখন কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির নির্মোহ ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেই আমাদের এগোতে হবে। এই নীতিগত অবস্থান আমাদের স্মরণে রেখেই বাস্তবসম্মত পথ খুঁজে পেতে হবে।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়শীল যে, আমাদের কমরেডরা সঠিক পথে চলবেন। আজকের বিশেষদিনে আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। আপনাদের পরিবারের সকলের জন্য শুভেচ্ছা।

রাজ্যের পরিচয় সত্তার শ্রেণি রাজনীতি ও সংযুক্ত মোর্চা

সৌম্য শাহিন

সম্প্রতি ফুরফুরা শরীফের তরুণ পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার ফ্রন্টের সঙ্গে বাম-কংগ্রেসের নির্বাচনী জোট বাংলার রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দলিত-মুসলমান-আদিবাসী শ্রমজীবি মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা এবং বিধানসভায় এই শ্রেণির মানুষের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতায়।

বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বৃত্তকে সম্পূর্ণ করলো এই জোট, এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। বিষয়টা এতোটা সরলরৈখিক নয় বোধহয়।

যাঁরা আর এস এসের সাথে আব্বাসের তুলনা করছেন, তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, জাকির নায়েক বা আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মতো আব্বাস সিদ্দিকীর বৃহৎ পুঁজির সাথে যোগ নেই। তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতায় শ্রেণি উচ্চারণের একটা সচেতন প্রয়াস থাকে, কারণ তাঁর সমর্থনের ভিত্তি মূলত কৃষিজীবি বাঙালি মুসলমান।

গত তিন দশক ধরে নয়া উদারবাদী শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে সারা বিশ্বজুড়েই খেটে খাওয়া মানুষের পিঠ ক্রমশ দেওয়ালে ঠেকে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী শাসকের অত্যাচার কার্যক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন জীবনযাপনের ন্যূনতম অধিকারগুলো একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ বাধ্য হচ্ছেন সামাজিক আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে ধরে নিজেদের ক্ষোভ-প্রতিবাদকে ব্যক্ত করতে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আজ এটা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ যে, এই সমস্ত নিপীড়িত আত্মপরিচিতির নির্ঘোষের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভয়-আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে কিভাবে তাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করবেন। ক্ষেত মজুর, ছোট চাষী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দাবির সাথে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধিকারের প্রশ্নকে মেলাতে হবে। একই সঙ্গে পরিবেশ আন্দোলন এবং লিঙ্গসাম্যের লড়াইকে শ্রেণির প্রশ্নে জুড়তে হবে। কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। সত্যিই কি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জোটের মধ্যে সেই তাগিদ আমরা দেখবো? নাকি শুধুমাত্র নির্বাচনকেন্দ্রিক সুবিধাবাদী আঁতাতেই আটকে থাকবে এই জোট?

একথা অনস্বীকার্য যে ফ্রান্সে স্যামুয়েল প্যাটির হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে আব্বাসের বক্তব্য বা তৃণমূল সাংসদ তথা চিত্র তারকা নুসরৎ জাহান সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক কটাক্ষ মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। দাড়ি-টুপিওয়ালা ধর্মগুরুমাত্রই সাম্প্রদায়িক, বিজেপির এই স্টিরিওটাইপ মান্যতা পায় এই ধরনের আচরণে। এখানেই বামপন্থীদের চরম পরীক্ষা। এই জোট শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক সুবিধাবাদী আঁতাত হলে বাংলার মানুষের কাছে বামপন্থীদের বিশ্বাসযোগ্যতা ধাক্কা খাবে। অপরদিকে শোষিত নিপীড়িত কৃষক সমাজে আব্বাসের বিপুল গ্রহণযোগ্যতাকে সদর্থক রাজনৈতিক অভিমুখ দিতে পারলে তা বাংলার রাজনীতির মোড় ঘোরানোর ক্ষমতা রাখে। তার জন্য প্রান্তিক মানুষের মধ্যে আব্বাসের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে হতদরিদ্র খেতমজুর, ভাগচাষীদের মধ্যে শ্রেণিরাজনীতির বীজ বপন করতে হবে।

কিছুদিন আগে ভাঙরে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক একটা মিটিংয়ে একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এদের অধিকাংশই বাম কর্মী-সমর্থক। নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনায় বারবার যে কথাটা উঠে আসছিল, তা হলো ২০১৮'র পঞ্চায়েত নির্বাচন লুঠ হওয়া এবং বিভিন্ন স্থানীয় ইস্যুতে তৃণমূলের নিচুতলার ওপর মানুষের তীব্র ক্ষোভ। লুম্পেন বাহিনীর দাদাগিরির সামনে এদের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারেনি বাম-কংগ্রেসের উচ্চতর নেতৃত্ব। এই জায়গায় আব্বাস সিদ্দিকীর সংগঠন তাদের লড়াইয়ের জমি অনেকটাই ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। ফুরফুরা সিলসিলার পরিচিতিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধর্মীয় জলসায় আব্বাস তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার যেভাবে চড়া সুরে বক্তব্য রেখেছে, তা ওর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। একইভাবে এন আর সি'র ইস্যুতে বিজেপিকেও বিঁধতে ছাড়েনি। তাঁকে কেন্দ্র করে একটা লড়াকু যুব বাহিনী তৈরি হয়েছে, যাঁদের তৃণমূলের লেঠেল বাহিনীকে ঢিলের বদলে পাটকেল ছোঁড়ার ক্ষমতা রয়েছে। ফলে আই এস এফকে ঘিরে স্থানীয় স্তরে বামপন্থী কর্মীদের মধ্যেও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। এর সুফল সংযুক্ত মোর্চা ভোটের বাক্সে পাবে বলেই আমার ধারণা।

একথা অনস্বীকার্য যে, এই মুহূর্তে আব্বাস সিদ্দিকী বাংলার রাজনীতিতে একটি ফেনোমেনন। বাংলার মানুষ এতোদিন হয় উচ্চবিত্ত মানসিকতার রাজনীতি, নয়তো সত্তার রাজনীতি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। আব্বাস সেই প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী নরম ও চরম সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি 'ভদ্রলোকের ভাষা' বলেন না। সেটাই রাজনীতিতে এতদিন ছড়ি ঘুরিয়ে আসা বাবু সংস্কৃতির জন্য সবথেকে বড় অস্বস্তির জায়গা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, আমফান দুর্নীতি, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নানারকমের অভিযোগ—সব মিলিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমনিতেই প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তৈরি হয়েছিল। আব্বাস সিদ্দিকীর শ্রেণিভিত্তি মূলত কৃষিজীবী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। ধর্মের দিক থেকে আই এস এফের সমর্থকদের প্রায় পুরোটাই অন্ত্যজ শ্রেণির মুসলমান। সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ হওয়ার ফলে সরকারের প্রতি এঁদের নির্ভরতা তুলনামূলক ভাবে বেশি, আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাও। এতদিন বিকল্পের অভাবে (মূলত বাম-কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য) তৃণমূলকে ভোট দিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু আজ এঁদের একটা বড় অংশ মনে করছেন যে তাঁদের এই পণবন্দী থাকার দিন শেষ। এতদিনে তাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান ভোট নিশ্চিতভাবেই কমবে। লাভবান হবে সংযুক্ত মোর্চা। এমনকি, যেখানে বাম বা কংগ্রেস প্রার্থীরা লড়বেন, সেখানেও তাঁদের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।

যেসব হিন্দু মানুষ ২০১৯-এ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সবাই সাম্প্রদায়িক, এটা ভাবা ভুল হবে। তৃণমূলের অপশাসনের ফলে বিরক্ত হয়ে একটা বড় অংশের হিন্দু (এমনকি মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের) মানুষও বিজেপিকে ভোট দেন। তাঁরা মনে করেছিলেন বাম-কংগ্রেসকে ভোট দিলে কার্যত সেটা ভোট নষ্ট করার শামিল। এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট, আগে যেটার পুরোটাই বিজেপি'র ঝুলিতে যাচ্ছিল মূলত প্রকৃত বিকল্পের অভাবে, তার একটা বড় অংশ জোটের দিকে আসবে। এর পুরোটাই সংখ্যালঘু মানুষের ভোট, এই ভাবনাটার মধ্যে একটা অতি সরলীকরণ রয়েছে।

"সাম্প্রদায়িক" তকমা থেকে বেরিয়ে আসার একটা মরিয়া প্রয়াস দেখা যাচ্ছে আব্বাস সিদ্দিকীর যাবতীয় রাজনৈতিক বক্তব্যে। আব্বাসের মেঠো ভাষার বক্তৃতা সমাজের খেটে খাওয়া অংশের মানুষের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দলিত-মুসলমান-আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা এবং বিধানসভায় এই শ্রেণির মানুষের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতায়। উচ্ছ্বাসম গতিতে তাঁর এই রাজনৈতিক উত্থান এবং দলিত ও আদিবাসীদের নিয়ে রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট যে বাংলার মেহনতি মানুষ কিন্তু ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের কারণে নিপীড়ন মেনে নিতে আর রাজি নন, রাজি নন কেবলমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হয়ে থাকতে। তাই আব্বাস যখন ভরা ব্রিগেডে পোড় খাওয়া নেতাদের সামনে সজোরে বলে ওঠেন যে "ভিক্ষা নয়, নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে এসেছি", তখন উদ্বেল হয়ে ওঠে সমবেত জনতা।

খেটে খাওয়া মানুষ নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দ্বারা চালিত সমাজে অসাম্যের সাথে লড়তে লড়তে আরও বেশি মৌলবাদী (radicalized) হয়ে যাচ্ছেন। আর আমরা, নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শুধুই তাঁদের সমালোচনা করে চলেছি। এটা মনে রাখা জরুরি যে, ভারতবর্ষে ধর্মকে দূরে সরিয়ে সাম্যবাদের চর্চা করা যাবে না। আমার নয়, কার্ল মার্ক্সের কথা। "ধর্মীয় নিপীড়নের বহিঃপ্রকাশ এবং একই সাথে প্রকৃত নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। ধর্ম শোষিতের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন সমাজের আত্মা। আফিমের মতই সাধারণ মানুষের জীবনের নানাবিধ যন্ত্রণাকে সহনযোগ্য করে তোলার একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি হলো ধর্ম।" —কার্ল মার্ক্স, "আ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ হেগেল'স ফিলজফি অফ রাইট", ১৮৪৪। সমাজের বিকৃত চৈতন্যের (inverted consciousness) বহিঃপ্রকাশ ধর্ম, কারণ সমাজব্যবস্থাটা নিজেই বিকৃত। সেটাকে বোঝার চেষ্টা না করে দূর থেকে গাল দিলে প্রগতিশীল আত্মরতি হতে পারে বড় জোর, কমিউনিস্ট হওয়া যায় না।

এখানে একটা কথা আমাদের বোঝা দরকার। তিন তালাকের ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রয়োগ, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবলোপ, বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন রায়, বিভিন্ন রাজ্যে লাভ জিহাদ আইন প্রণয়ন এবং সর্বোপরি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট, ২০১৯-এর মাধ্যমে কার্যত মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে রূপান্তরিত করার কাজ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে লাগাতারভাবে করে চলেছে। এছাড়াও আখলাখ, পেহলু খাঁ, আফরাজুল, তবরেজ আনসারীর মতো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে স্রেফ মুসলমান হওয়ার 'অপরাধে' পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। শাহীনবাগে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী অবস্থানকে কেন্দ্র করে গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রীয় মদতে গণহত্যা চালানো হয় খোদ রাজধানীর বুকে। যাঁরাই এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতার প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদের হয় কালবুর্গি, দাভোলকর বা গৌরী লঙ্কেশের মতো খুন হতে হয়েছে, নইলে সুধা ভরদ্বাজ, ভারাভারা রাও, গৌতম নওলাখা, আনন্দ তেলতুম্বে, কাফিল খান বা উমর খালিদের মতো দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবন্দী হতে হয়েছে। এমনকি, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার প্রতিও আর মানুষ আস্থা রাখতে পারছেন না। আমরা দেখেছি, একজন প্রধান বিচারপতি, যাঁর বিরুদ্ধে যৌনহেনস্থার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তিনি অবসর নেওয়ার পর রাজ্যসভায় শাসকদলের দ্বারা মনোনীত হন। এই অবস্থায় কোণঠাসা হতে হতে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ একটা আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে ভুগছে। প্রতিনিয়ত দেশপ্রেমের প্রমাণ দেওয়ার থেকে তাঁরা আজ নিজেদের আত্মপরিচয়কে সজোরে ঘোষণা করতে চাইছেন। আর সাধারণ মুসলমানদের এই অসহয়তার সুযোগ নিয়েই রমরমা হচ্ছে ক্রুড আইডেন্টিটি পলিটিক্সের।

আমি ব্যক্তি আব্বাস সিদ্দিকীকে নিয়ে আগ্রহীই নই। তাঁর টানে যাঁরা ব্রিগেড ভরালো, সেই প্রান্তিক মানুষের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্বে আগ্রহী। বামপন্থীরা যদি এই সময় তাদের বিকল্প রাজনৈতিক মডেল দিতে পারে, দেশব্যাপী চলমান কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার শোষিত নিপীড়িত ক্ষুদ্র ও জমিহীন কৃষককে শ্রেণির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারে, তবেই এত কথা গঠনমূলক পরিণতি পাবে। তার জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্পে প্রভূত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে না বোঝা এবং পুঁজিনির্ভর শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের প্রতি মোহ অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে।

কমিউনিস্টদের একটা অংশ বলেন 'শুধুমাত্র শ্রেণির প্রশ্নে সমস্ত নিপীড়িত মানুষ এক হবেন।' এই সরল উত্তর শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে ধরে নেওয়া হয় যেন শ্রেণিশোষণে ঐ পরিচয়গত নিপীড়নগুলো কোনও ভূমিকা রাখে না। ঐ পরিচয়গত নিপীড়নগুলোকেই যে অধিকতর শোষণ, অতি-মুনাফা পাওয়ার কাজে, সস্তা শ্রমিক তৈরি কাজে, সস্তায় শ্রমশক্তি কেনার কাজে ব্যবহৃত হয়, তারা তা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে অসম্পূর্ণ স্লোগান ওঠে—জাত নয়, ভাতের লড়াই করুন। আর এভাবেই তাঁদের কাছে গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ে নিপীড়িত জাতের আত্মমর্যাদার লড়াই, সমানাধিকারের লড়াই।

কিন্তু নিপীড়িত পরিচয় নিয়ে উঠে দাঁড়ানো গোষ্ঠীগুলোও কি একথা বোঝেন? বোঝেন যে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই পরিচয়গত নিপীড়ন শুধু তাকে হেয় করা নয়, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর পরিচয়ের গোষ্ঠীর কাছ থেকে সস্তা শ্রম পাওয়ার উপায়ও বটে! একজন দলিত যুবক কি বোঝেন যে একজন মুসলমান চাষীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়গত নিপীড়ন আসলে তাঁর কাছ থেকে সস্তা শ্রম আদায়ের কায়দা, কিংবা মুসলমান চাষীও কি সেকথা বোঝেন? একজন উচ্চবর্ণের বাঙালি বেকার যুবক কি এক দলিত বিহারী মজুরের সমস্যার কথা বোঝেন, বোঝেন একজন সাঁওতাল বা গোর্খা 'পরিযায়ী' শ্রমিকের সমস্যার কথা?

এই বোঝায় পৌঁছানো, এই বোধে পৌঁছানো যে, এই পরিচয়গত নিপীড়নের আসল উদ্দেশ্য শুধু তাকে হেয় করা নয়, বরঞ্চ কর্পোরেটশাসিত এক ব্যবস্থার অধীন করে রাখা, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে জনজাগরণের চাবিকাঠি। এই কাজে আব্বাস সিদ্দিকীদের মতো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ধর্মগুরুদের ভূমিকা কতটা সদর্থক হয়, তা একমাত্র সময়ের কষ্টিপাথরেই নির্ধারিত হবে।

(লেখক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস-এর অর্থনীতির অধ্যাপক)

কোনও আপস নয়

১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ

কমরেডগণ,

আজ রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান করে আমাকে আপনারা বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। সেইসঙ্গে আমার কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথেষ্ট গুরুভার। দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সব শক্তি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস প্রতিহত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প তাদের জনসমক্ষে আনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা সহজ কাজ নয়। এই কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও কঠিন হয়ে ওঠে যখন দেখি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মতো ব্যক্তি রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। স্বামীজির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

কমরেডগণ, আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব যদি আমাদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তা আলোচনা করার আগে এই সম্মেলন আয়োজন করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছিল তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করি। এই সম্মেলনে মিলিত হওয়ার আগে যে বাধাবিপত্তি পার হতে হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু ধারণা আছে। প্রথমত, সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন করার আগেই রামগড়ে অনেক স্থূল ও বাস্তব বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়ত, সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী নিয়মিত বিরুদ্ধ প্রচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাকে খণ্ডন করতে হয়েছে। এই প্রচারে সব থেকে বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে বামপন্থীদের (অথবা ভুয়ো বামপন্থীদের) একটা অংশ খোলাখুলিভাবে এই সম্মেলনের নিন্দা করেছে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালিয়ে সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক মাস ধরেই এই ঘটনা উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠেছে যে কিছু সংখ্যক বামপন্থী দক্ষিণপন্থীদের তাঁবেদারের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যাঁরা তল্পিবাহক তাঁরা যুক্তি দেখাচ্ছেন, কংগ্রেসই তো বৃহত্তম আপসবিরোধী সম্মেলন, অতএব এই ধরনের আর একটা সম্মেলনের কোনও প্রয়োজন নেই। পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা আমাদের সামনে তুলে ধরে দেখানো হচ্ছে যে কংগ্রেস আপসবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাঁরা রাজনীতিজ্ঞ, যাঁরা রাজনৈতিক কর্মী তাঁদের এতটা সরল হওয়া কি শোভন, বা সঙ্গত?

পাটনা প্রস্তাবের সবটা, বিশেষ করে, তার শেষের অংশটুকু, ভাল করে পড়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাতে এমন অনেক ফাঁক আছে যা প্রস্তাবটির স্বকীয় গুরুত্বকে হ্রাস করেছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। আইন অমান্যের ওপর মহাত্মাজীর পরবর্তী দীর্ঘ মন্তব্য থেকে কোনওভাবেই আমরা এই ইঙ্গিত পাই না বা আশ্বস্ত হই না যে সংগ্রামের পর্ব শুরু হয়ে গেছে।। প্রকৃতপক্ষে গত দেড় বছর ধরে আমাদের কাছে যা বিভ্রান্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল, একদিকে যেমন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গরম গরম প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এবং ওই ধরনের বিবৃতি প্রকাশ করছেন, তেমনই একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বা দক্ষিণপন্থী অন্য নেতারা এমন মন্তব্য ও বিবৃতি দিচ্ছেন যাতে সাধারণের মনে একেবারেই ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, যদি গত ছ'মাস ধরে বামপন্থীরা সমানে চাপ দিয়ে না যেতেন তাহলে পাটনা প্রস্তাবও কি গৃহীত হতে পারত?

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের সমস্ত রকম আলোচনার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা শোনার জন্য সারা দেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু এই ঘোষণা কি আসন্ন? যদি তাই হয়, তাহলে কবে?

কমরেডগণ, যাঁরা জাহির করছেন যে কংগ্রেসই বৃহত্তম আপসবিরোধী সম্মেলন, সম্ভবত তাঁদের স্মৃতিলোপ হয়েছে। তাঁরা কি ভুলে গেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ না করে সিমলায় গিয়ে মহামহিম বড়লাটকে জানিয়ে এলেন যে, যুদ্ধচালনার ব্যাপারে তিনি গ্রেট ব্রিটেনকে বিনাশর্তে সাহায্যদানের পক্ষপাতী? তাঁরা কি এটুকু বোঝেন না, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একচ্ছত্র ডিক্টেটর, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে? তাঁরা কি ভুলে গেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আসল প্রশ্নটি, যথা পূর্ণ স্বরাজের জন্য আমাদের দাবির প্রশ্ন, ধামাচাপা দিয়ে ভুয়ো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লির দাবিকে সামনে তুলে ধরেছে। তাঁরা কি ভুলে গেছেন, প্রধান প্রধান কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা, তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও আছেন, কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লির প্রকৃত রূপটিকে ক্রমাগত ছোট করে চলেছেন এবং তাঁরা এতদূর পর্যন্ত গেছেন যে তাঁদের সাধের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লি নির্বাচন করার ভিত্তি হিসাবে আইন পরিষদের বর্তমান ভোটাধিকারকে এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকেও তাঁরা মেনে নিতে রাজি? তাঁরা কি ভুলে গেছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর থেকে কিছু কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রী সরকারি ক্ষমতায় ফের বসার জন্য অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন? ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপসের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী গত ছ'মাস ধরে যে একই রকম মনোভাব পোষণ কর চলেছেন, তা কি তাঁরা লক্ষ্য করছেন না? এবং তাঁরা কি জানেন না যে গরম গরম কথার আড়ালে আপসের জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আমাদের দুর্ভাগ্য, ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের কথার ওপর আর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রস্তাব ও বিবৃতির কোনও অভাব হয়নি। সারা দুনিয়ায় তাদের প্রভাব পড়ুক না বা নাই পড়ুক, ইংরেজদের ওপর যে কোনও প্রভাবই পড়েনি, এ কথা ঠিক। ইংরেজ জাতি আসলে বাস্তববাদী। আমরাও আদ্যিকালের সেই জবাব শুনেছি, যতদিন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা অমীমাংসিত থাকবে ততদিন পূর্ণ স্বরাজের কথা ভাবাই যায় না।

গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতবর্ষ এক অস্বাভাবিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই সময়ে মানুষের মনে নানারকম দ্বিধা ও সংশয় জাগছে। প্রথমে পতন হল নেতাদেরই। যে নৈতিক অধঃপতনের দিকে তাঁরা পা বাড়িয়েছেন, তা মহামারীর মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের যদি এই পচন রোধ করতে হয় তাহলে ব্যাপকভাবে তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চলাতে হবে। উচিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক না রাখতে যাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের নিয়ে সর্বভারতীয় এক সম্মেলন আহ্বান করা।

আমরা যে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা বিরল হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তা মোটেই নতুন নয়। সাধারণত কালান্তরের সময় এই রকম সঙ্কট দেখা দেয়। ভারতবর্ষে আমরা বিদায়ী একটি যুগের ওপর যবনিকাপাত করছি, সেই সঙ্গে নতুন যুগের অরুণোদয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের যুগ আমাদের সামনে আসন্ন।

পুরনো কাঠামোটা যখন নিজের ভারে ভেঙে পড়ছে এবং পুরনো ভগ্নস্তূপ থেকে যখন নতুনের আবির্ভাব এখনও হয়নি, তখন মানুষ যে বিভ্রান্ত হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে অনিশ্চয়তার এই দুঃসময়ে আমরা যেন আমাদের ওপর, দেশবাসীর ওপর, মানব জাতির ওপর আমাদের বিশ্বাস না হারাই। এই সংকটের মধ্যেই হয় জাতির নেতৃত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা। দুর্ভাগ্যবশত সেই নেতৃত্ব আশানুরূপ হতে পারেনি।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যখন অক্টোবর বিপ্লব শুরু হল তখন বিপ্লবকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে সেই বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বলশেভিকদের অধিকাংশই কোয়ালিশনকে নস্যাৎ করে আওয়াজ তুললেন, 'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতকে দিতে হবে।' দ্বিধা-সন্দেহভরা এই সময়ে লেনিনের সময়োচিত নেতৃত্ব না পেলে কে বলতে পারে রুশ ইতিহাসের মোড় কোন দিকে ঘুরত? লেনিনের অভ্রান্ত স্বজ্ঞান (বা প্রজ্ঞা) যা চূড়ান্তভাবে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল, তা রাশিয়াকে এমন এক বিপর্যয় ও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিল যা কিছুদিন আগে স্পেনকে কবলিত করেছে।

এবারে বিপরীত এক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯২২ সালের ইতালি ছিল সব দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তার একমাত্র প্রয়োজন ছিল ইতালীয় এক লেনিনের। কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল, সে লোক এল না, সোস্যালিস্টদের হাত থেকে সুযোগ চলে গেল। ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিতো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগালেন।

বর্তমান সঙ্কটে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এত দিন যাঁরা বামপন্থী বলে পরিগণিত হতেন তাঁদের দলে ভাঙন। আসন্ন ভবিষ্যতে হবে ভারতবর্ষের বামপন্থার অগ্নিপরীক্ষা। যাঁদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব দেখা যাবে তাঁদের ভুয়ো বামপন্থী স্বরূপ অচিরেই সকলের সমানে প্রকাশ পাবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদেরও তাঁদের কর্মে ও অচরণে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে তাঁরা সত্যিই অগ্রগামী ও সচল।

বামপন্থা বা বামবাদ বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে এখানে দু-একটা কথা বলা দরকার। বর্তমান কাল আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্ব। এই কালে আমাদের প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো এবং ভারতবর্ষের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা আসার পরে জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ শুরু হবে এবং সেই পর্ব হবে আমাদের আন্দোলনের সোস্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক পর্ব। আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পর্বে তাঁরাই বামপন্থী বলে গণ্য হবেন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাবেন। যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতস্তত করবেন, দ্বিধাগ্রস্ত হবেন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার মনোভাব যাঁদের মধ্যে দেখা যাবে তাঁরা কোনও কারণে বামপন্থী হতে পারেন না।

এই মুহূর্তের সমস্যা : 'ভারতবর্ষ কি এখনও দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্তাধীনে থাকবে না তা চূড়ান্তভাবে বামপন্থা গ্রহণ করবে?' এর জবাব একমাত্র বামপন্থীরাই দিতে পারেন।

এদেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস যদি সম্ভবপর হয় তাহলে ভারতবর্ষের বামপন্থীদের ভবিষ্যতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে না, সাম্রাজ্যবাদের নবজাত ভারতীয় শাগরেদদের সঙ্গেও তাঁদের লড়তে হবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে।

সময়ের পুরো সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বিলম্ব হওয়ার আগে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী তূর্যনিনাদে সবাইকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের যত শক্তি ও সাহস আছে সব নিয়ে তাঁর ডাক যেন আমরা সাড়া দিই। এই সম্মেলন থেকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ও তার ভারতীয় মিত্রদের কাছে আমাদের সাবধানবাণী পাঠাতে হবে। এই সম্মেলনের সাফল্যের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের অবসান।

আমাদের বিদায় নেওয়ার আগে এই সম্মেলনর প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থায়ী একটা সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেকে এখন বুঝতে পারছেন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যদি জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার ডাক না দেয়, তাহলে অন্যদের সেই ডাক দিতে হবে। অতএব সব দিক বিবেচনা করে এই সম্মেলনের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং এই সঙ্কটের সময় ওয়ার্কিং কমিটি যদি আমাদের নিরাশ করে, সেই কথা ভেবেও স্থায়ী একটি সংগঠন গড়া দরকার। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, এই সম্মেলনের আলোচনা জাতিগতভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম ও কাজ চালিয়ে যাওয়ার ভূমিকা হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ফ্যাসিবাদের মুখোমুখি

মানব মুন্সী

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন নিয়ে চলমান বিতর্ক প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা প্রয়োজন, গত শতাব্দীতে বিশ্বে আবির্ভূত ফ্যাসিবাদের একান্ত নকল বর্তমান সময়ে দেখা দিতেও পারে নাও পারে। এতদসত্ত্বেও লক্ষণীয়, সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই হিটলারের ফ্যাসিস্ট শাসন জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রাপ্ত নাগরিক স্বাধীনতার পরিসরটুকু ভারতে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ বিলোপ করতে বদ্ধপরিকর, জীবন-জীবিকার সর্বত্র ফ্যাসিবাদের মিত্র কর্পোরেট পুঁজির করতলে সমর্পিত হতে চলেছে। বিজেপির নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতে ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের বিস্তার প্রতিরোধ করাই এই মুহূর্তে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য বা রণকৌশল। সাম্প্রতিক অতীতে আসাম, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশে ফ্যাসিবাদের এক খণ্ডিত চেহারা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আসন্ন লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হতে হবে।

দমন পীড়ন দুর্নীতির জন্য এই তৃণমূল কংগ্রেস বহু মানুষের কাছে অত্যাচারী ও লুঠেরার প্রতীক বলে বিজেপি তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করার বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে, যা কয়েক বছর আগেও অভাবিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যখন ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক- রাজনৈতিক আক্রমণে জর্জরিত, সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত মোর্চাকে বিকল্প হিসাবে হাজির করার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের লড়াইটাকে মুখ্য রাজনৈতিক রণনীতি হিসাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিজেপির অনুশাসনে ধর্মোন্মদনা, ছদ্মজাতীয়তাবাদের উন্মাদনা, উগ্র জাতিবিদ্বেষের প্ররোচনা, অতীত গৌরব গাঁথার পূজা, কুসংস্কারের পুনর্জাগরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণার রাজনীতির বিষবাষ্পে সারা দেশ এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে চলেছে।

আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে কয়েক হাজার মানুষ ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বন্দি জীবনযাপন করছে, সারা দেশে ডিটেনশন ক্যাম্পে কয়েক হাজার মানুষ ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বন্দি জীবনযাপন করছে, সারা দেশে ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, এর প্রতিরোধে সোচ্চার হতেই হবে। একশ্রেণির মানুষকে দেখা যাচ্ছে ধর্মবিদ্বেষে জারিত হয়ে এন আর সি, সি এ এ, এন পি আর-এর সমর্থনে মুখর হয়ে উঠেছে।

দেশের বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশে পৌরাণিক ঘটনাকে সত্য বলে বর্ণনা করতে যখন লজ্জাবোধ করে না, তখন বোঝাই যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী সংস্কার মানুষের মস্তিষ্ককে কিভাবে গ্রাস করছে। তাই আমরা করোনা থামাতে থালা বাসন বাজাই, শাঁখ বাজাই এবং নানা অপকর্ম করি। আমাদের বোধ, চেতনাকে শাসকশ্রেণির পদতলে গচ্ছিত রেখেই এ সব করি।

এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসাবে এন আর সি-সি এ এ-এন পি আর বিরোধী গণআন্দোলন এবং বর্তমানে চলমান কৃষি বিল বিরোধী আন্দোলন ছাড়া বিজেপি জমানার বিগত বছরগুলিতে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য গণজাগরণ এন ডি এ সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ করা যায় নি। অপরদিকে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, ভীমা কোরেগাঁও এবং বিভিন্ন মামলায় প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম মূল স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা তার স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়েছে বা দিতে চলেছে। এভাবে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা সব দিক দিয়েই মানুষকে পদানত করার আয়োজন চলছে। এটাই তো ফ্যাসিবাদের পদচারনার সংকেত।

এমন এক প্রেক্ষাপটে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনগুলি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এই মুহূর্তে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলাই অন্যতম মুখ্য রাজনৈতিক কর্তব্য। আসলে অনেকে স্বৈরাচার এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে পার্থক্যটা উপলব্ধিতে অক্ষম। এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বামপন্থীদের অতি সক্রিয় হতে হবে। এই কাজে চলমান গণআন্দোলনগুলি বিশেষত দিল্লীতে 'সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা' সরকারের কর্পোরেট পূজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তা ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব। এই আন্দোলনের অভিঘাতে এন ডি এ জোটে ভাঙ্গন ধরেছে। ফ্যাসিবাদী জোট ছেড়ে আন্দোলনের পক্ষ নিয়েছে। সময় এসেছে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জোট নির্মাণের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফ্যাসিবাদের সাধারণ প্রকাশ, দেশরক্ষার নামে সামরিক শক্তি জাহির করা এবং পেশী শক্তির মাধ্যমে ছদ্ম জাতীয়তাবাদ প্রদর্শন, বিগত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তারই এক নমুনা দেখা গেছে। জাতীয়তাবাদী আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে কাজ হাসিলের কৌশলটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভালই জানা আছে। এই কৌশলেরই অঙ্গ বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলার পাশাপাশি কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ দমননীতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিভাত করা। জনগণকে উজ্জীবিত করার জন্য জাতীয়তাবাদী মাদক অব্যর্থ ওষুধের কাজ করে, ফ্যাসিবাদী প্রেরণায় জনগণকে বোঝানো হয় যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জনগণের জীবনধারণের যাবতীয় তীব্র সমস্যাগুলি শিকেয় তুলে রাখাই বিধেয়।

ফ্যাসিবাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য আধুনিকতার বিরুদ্ধে এই ধরনের ছদ্ম ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি এক বিশেষ প্রবণতা হিসাবে দেখা যায়। প্রাচীন লোকাচার, আধুনিকতা বিরোধী ধর্মানুষ্ঠান আর কিংবদন্তীর লোককথাগুলিকে সত্যিকারের ইতিহাস হিসাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলে অবিরাম। আমরা দেখেছি, ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক নেতারা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের বোঝাচ্ছেন গণেশের মাথায় হাতির মাথা লাগানো প্রাচীন ভারতে শল্য চিকিৎসার অভাবিত উন্নতির নিদর্শন। ধর্ম নামক আফিমের মাদকতায় আচ্ছন্ন জনগণ প্রাচীন স্বর্ণযুগের গৌরবগাথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ফ্যাসিবাদী সরকার বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সহ আকর্ষণীয় সব কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিয়ে আরও বড় করার যাবতীয় সুযোগ প্রদান করে। বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি যাবতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে দখলদারি কায়েম করতে এক শক্তিমান সরকারের উপর নির্ভর করতে চায় বলে ফ্যাসিবাদী সরকারের সঙ্গে স্থিতিশীল দোস্তি করতে আগ্রহী হয়। শক্তিমান সরকার গঠনের জন্য অর্থবল, পেটোয়া প্রচার মাধ্যম দিয়ে সাহায্য করে, বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি।

অনেকেরই প্রশ্ন হিটলার বা মুসোলিনীর মতো বিজেপি তথা মোদীকে কি ফ্যাসিবাদী বলা যেতে পারে? ফ্যাসিবাদ এক মতাদর্শ, যে মতাদর্শ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা সব কিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই ভারতে যার সূচনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সূচনাপর্বে আমরা দেখছি হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষ এবং জাতিগত ঘৃণার রাজনীতির সাহায্যে সঙ্ঘ পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হিটলারের ফ্যাসিবাদ আর্যজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলে শুরু হয়েছিল, শেষ হয়েছিল ইহুদিদের গণহত্যা এবং সারা দুনিয়াকে ভয়ঙ্কর মারণ যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে। আর এস এস-সঙ্ঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদের মূল স্লোগান হিন্দু আধিপত্য সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আমরা জানি না এর শেষ কোথায়! বর্তমান পরিস্থিতিতে শাসকদল বিরোধী কোনও আলোচনা, লেখালেখি বিপজ্জনক, দেশদ্রোহীর তকমালাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, সঙ্ঘ পরিবারের আসল চেহারাটা এই বাংলায় ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রকাশিত হবে এবং সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ওরা মরিয়া যে কোনও মূল্যে এই বাংলায় ক্ষমতা দখল করতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে বিজেপি'র পক্ষে সারা ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা রয়েছে। মাত্র ৭।৮টি রাজ্যে একক শক্তিকে ক্ষমতায় আছে ওরা। কয়েকটি রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির সাথে জোট করে ক্ষমতায় আছে। কেন্দ্রে তাদের বেশিরভাগই জোট সঙ্গী দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুজোট মেরুকরণের মধ্যে দিয়ে এবং আরও নানা বৈধ অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় আসা দরকার। তাই পশ্চিমবঙ্গকে দেশ জুড়ে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার ল্যাবরেটরি করার জন্য এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসাটা তাদের বিশেষ জরুরি। উত্তর ও পশ্চিমভারতের রাজ্যগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদের পক্ষে মেরুকরণ এখনও সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত গ্রামবাংলায় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে একধরনের সম্প্রীতি সঙ্ঘ পরিবারের কাছে দুঃসহ এবং এই সম্প্রীতি ভেঙ্গেই ওদের মতাদর্শের প্রচার বিস্তৃত হতে পারে।

আর এস এস-সঙ্ঘ পরিবারকে মুসোলিনী-হিটলারের ভারতীয় সংস্করণ রূপে চিহ্নিত করে 'No Vote to BJP'-র নেতিবাচক স্লোগানের পরিবর্তে জোর গলায় বলতে হবে—কোন দলকে ভোট দিতে হবে, কেন দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ কায়েম হওয়ার প্রশ্নে সংসদীয় দলগুলিকে মুখ খুলতে বাধ্য করতে হবে। বলতে হবে কারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকভাবে আগ্রহী। সাহসে ভর করে এই ইতিবাচক ও অতি প্রয়োজনীয় কাজটি দ্বিধামুক্ত হয়েই করতে হবে।

বস্তুত, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি'র কোনও মৌলিক পার্থক্যই নেই। তদুপরি তৃণমূল কংগ্রেস দলটির গণতন্ত্র বিরোধিতা, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করার অসদুদ্দেশে নিম্নশ্রেণির চমক বা নাটুকেপনা এবং সর্বব্যাপ্ত দুর্নীতি প্রভৃতি আর এস এস ও বিজেপির মতো এক অপশক্তিকে সুযোগ করে দিচ্ছে। চরম নীতি আদর্শহীন একটি রাজনৈতিক দল কখনোই ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান নিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেই যেমন এই রাজ্যে বিজেপি'র অনুপ্রবেশ, ঠিক তেমনই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখলে মরীয়া অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টা রুখতে হলে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের সর্বশক্তি দিয়ে জয়ী করতে হবে।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ৫ টাকা

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১০ টাকা

বাম্পন্থা-সেকাল একাল

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১৫ টাকা

সংগ্রহ করুন

Vol. 68 Issue No. 30 শনিবার ২০ মার্চ ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

দুর্বার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র গাজিপুরে আর এস পি নেতৃত্ব

গত বছর নভেম্বর মাসের শেষদিক থেকেই ভারতের কৃষক আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠে ক্ষিপ্রগতির পাহাড়ি নদীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোদী সরকার গত বছর ৫ জুন যখন প্রায় সমগ্র দেশ কোভিড-১৯ আতঙ্কে কম্পমান, যখন সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত, সেই সময়েই বিশ্বের অতিসংকটাপন্ন পুঁজিবাদের নির্দেশে চরম অগণতান্ত্রিকভাবে তিনটি কৃষি আইন এবং সংশোধিত বিদ্যুৎ আইন অর্ডিনান্স মারফৎ বলবৎ করে। কোনো সন্দেহ নেই যে, মুখ্যত নরেন্দ্র মোদীর অতি ঘনিষ্ঠ দুই অর্বুদপতি ব্যবসায়ী গৌতম আদানি এবং মুকেশ আম্বানির প্রভূত মুনাফা অর্জনের সুবিধা করে দিতেই এমন অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছিল। কৃষকদের আন্দোলন সেই সময়কাল থেকেই পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের নানা অঞ্চলে সংগঠিত হতে থাকে। বস্তুত, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সমস্ত রাজ্যের কৃষকরা ক্ষোভে দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সামিল হতে শুরু করেন।

দেশের বহুশত কৃষক সংগঠনকে সমন্বিত করে সংযুক্ত কিসান মোর্চা গড়ে ওঠে। এই সারা ভারত সংগঠন মুখ্যত চল্লিশটি কৃষক সংগঠনের সমাহারে গঠিত হয় এবং একান্ত গণতান্ত্রিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ণীত হয়। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে বাঁধভাঙা নদীর মতো দুকূল প্লাবিত করে রাজধানী দিল্লির শাসকদের কাছে ন্যায় বিচার দাবি করে। মোদী সরকার এতটাই নির্মম এবং জনস্বর্থ সম্পর্কে উদাসীন যে তাদের নির্দেশে হরিয়ানা প্রদেশে বিজেপি দলের মনোহরলাল খাট্টার সরকার নৃশংসভাবে কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করতে প্রথম দিকেই জলকামান, টিয়ার গ্যাস, লাঠি এমনকি বন্দুকসহ বিক্ষুব্ধ মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষকে চরমভাবে আহত করেও সেই জনজোয়ার বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় খাট্টার সরকার।

সম্ভবত সমগ্র বিশ্বে কেউ শোনেননি যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিরোধ করতে দেশের সরকার রাজপথে গর্ত করেছে। মোদী সরকার হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য থেকে আসা মিছিলগুলির গতিরোধে পরিখা নির্মাণ করেছে। এতসবের পরেও চরম ব্যর্থতা হতাশ করেছে মোদী-শাহ'র সরকারকে। কেন্দ্রের কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র খোঁজার অছিলায় বহুবার আলোচনা করে সময় নষ্ট করেছেন। পরিকল্পিতভাবে তা হয়েছে। কৃষকদের সম্মিলিত নেতৃত্ব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, কৃষক ও দেশ বিরোধী তিনটি আইন নিঃশর্তে বাতিল করতে হবে। দেশের সংসদে বিশেষ করে, লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনৈতিক সুযোগ নিয়ে অর্ডিনান্সগুলিকে আইনে পরিণত করা হয়। রাজ্যসভায় পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে ঐ তিনটি অনৈতিক আইন বলবৎ করা হয়। মোদী শাহর দায়বদ্ধতা প্রথম থেকেই সংখ্যাল্প পুঁজিপতিদের কাছে। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ তাঁদের কাছে কোনও গুরুত্বই বহন করে না।

আর এস পি দলগতভাবে এবং সারা ভারত সংযুক্ত কিসান সভা কৃষকদের স্বার্থে এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের নানা রাজ্যে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে দ্রুত। সর্বত্রই আর এস পি নেতৃত্ব সম্ভবমতো যুক্ত থেকেছেন এই আন্দোলনে। আর এস পি'র দিল্লি রাজ্যকমিটি প্রত্যক্ষভাবে গাজিপুর, টিকরি, সিংঘু বা সাজাহানপুর সীমান্তে বারংবার পৌঁছে সহমর্মিতা জানিয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি রাজধানীর বুকে যে ঐতিহাসিক ট্রাক্টর মিছিল হয় সেই ক্ষেত্রেও দিল্লির আর এস পি নেতৃত্ব যোগদান করেছেন। দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. শত্রুজিৎ সিং, অন্যতম কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কম. আর এস ডাগর, কম. মানবেন্দ্র সিং, কম. সরিফুল ইসলাম, কম. শিউপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বারবার আন্দোলন স্থলে উপস্থিত থেকেছেন। আর এস পি সাংসদ কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন নিজে বিক্ষোভ অবস্থানে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ চলমান ঐতিহাসিক গণআন্দোলন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

গত ১০ মার্চ আর এস পি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য দুর্বার কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে পৌঁছে যান গাজিপুর সীমান্তে। সঙ্গে দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরাও ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম. ভট্টাচার্য'র সঙ্গে পি এস ইউ নেতা কম. নওফল মহঃ সফিউল্লা ছিলেন। এক অনন্য গণআন্দোলনের অসামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন নেতৃত্ব।

গাজিপুর সীমান্ত দিল্লি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে পৌঁছানোর পথে বিস্তর বাধা। রাস্তা বন্ধ বহু জায়গায়। রাস্তা খুঁড়ে রাখতে হয়েছে। এসবের ফলে প্রায় ২০-২২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেই গাজিপুর পৌঁছানো সম্ভব হয়। সেখানেও মনে হয়েছে যেন কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখতে সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিয়েছে! পথের ওপর একাধিক স্তরে কাঁটাতার দিয়ে গার্ডওয়াল, পথের ওপর বড় বড় পেরেক বা বর্শা পুঁতে রাখা, পথ গভীরভাবে খোঁড়া এবং অপরপ্রান্তে বহুসংখ্যক আধা সামরিক বাহিনী বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষের অগ্রগমন বন্ধ করতে প্রস্তুত। মনেই হয়নি যে, দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ কৃষিজীবী, যাঁরা একশ শতাংশ দেশবাসীর অন্নসংস্থান করেন, তাঁদের প্রতি মোদী সরকারের কোনও সার্থক দৃষ্টিভঙ্গি আছে!

অসংখ্য কৃষক ছোট বড় জোতের মালিক, হিন্দু-মুসলমান-জাঠ-গুর্জর-হিন্দিভাষী, পাঞ্জাবি ভাষী বা অন্যান্য ভাষাভাষি মানুষদের মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত গাজিপুর সীমান্ত। হাজার হাজার ছাউনি, লঙ্গর, সারাদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে গণমিছিল এবং নানা ধরনের মানবিক সহায়তার অনন্য প্রকাশ লক্ষ করা গেল। উপস্থিত কৃষক নেতারা আর এস পি নেতাদের বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করেন। দীর্ঘসময়ব্যাপী সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেশের সরকার এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা হয়। তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থেকে মোদী ও বিজেপিকে অপসারণ করতে না পারলে দেশের মানুষের প্রবল সমস্যার কোনো সমাধানই সম্ভব নয়। আর এস পি দিল্লির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি হিন্দি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এক্ষেত্রেও আন্দোলনকারীদের উৎসাহ বেশ লক্ষ করা গেছে।

যুক্তফ্রন্টই রুখতে পারে ফ্যাসিবাদের উত্থান

১-এর পাতার পর

জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কংগ্রেস দলকে পরিচালিত করতে প্রয়াসী হলেন।

এক বছরের মধ্যেই ১৯৩৯ সালে যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। তখনও কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নীতিগত প্রশ্নে বহুমুখী মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও দেশবাসীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশের দ্যোতনারূপে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতির ভাষণে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন তিনি। একদিকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জঙ্গি গণআন্দোলনের সমর্থনে অনুশীলন, এইচ এস আর এ, যুগান্তর সহ বিভিন্ন বিপ্লবী শক্তি ও সংগঠন। অপরদিকে উদারপন্থী স্বঘোষিত সমাজতন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব বামপন্থী শিবিরের এই দোলাচলের সুযোগে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব গান্ধীবাদীদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি পট্টভি সীতারামাইয়া নির্বাচিত না হওয়ার জ্বালা মেটাতে না পেরেই কংগ্রেসের মৌলিক নীতি রূপে গান্ধিজির হাতে সংগঠনের স্টিয়ারিং রাখার প্রস্তাব পেশ করলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। বামপন্থীদের সমর্থনে সাবজেক্ট কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবটি জয়লাভ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্য অধিবেশনে সি পি আই পন্থী এবং সি এস পি'র সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বিরোধিতা ও নিস্পৃহ থাকায় শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হল। এভাবেই ত্রিপুরিতে সুভাষচন্দ্রের ক্ষমতা হরণ করে দক্ষিণপন্থীরা নেতৃত্ব দখল করলেন।

অদম্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও ১৯৩৯ সালের মার্চ মাস থেকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই জুন মাসে পুনরায় ফরোয়ার্ড ব্লক, সি এস পি, কিষাণ সভা, সি পি আই, লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস (এম এন রায় গোষ্ঠী) লেবার পার্টি, সি এন পি ভুক্ত অনুশীলন ও এইচ এস আর এ প্রমুখদের সমন্বয়ে 'বাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করেন।

১৯৩৮-৩৯ সালের ঘটনাবলী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠনের প্রয়োজনীতাকে অপরিহার্য করল। বিশেষ করে সুভাষ বসুকে বহিষ্কারের ঘটনায় সি এস পি, এম এন রায় গোষ্ঠী এবং সি পি আই পন্থীরা গান্ধী নেতৃত্বের সর্বময় প্রভাবকে অস্বীকার করতে না পেরে 'বাম সমন্বয় কমিটি' থেকে বেরিয়ে এলেন।

এরপরই সেই ঐতিহাসিক আপস বিরোধী সম্মেলন ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ এবং সেই দিনই আপসবিরোধী সম্মেলন থেকে ফিরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে অন্য একটি শিবিরে সম্মেলনে সমবেত অনুশীলন এবং এইচ এস আর এ'র বিপ্লবীদের আর এস পি দলের গঠন। অকস্মাৎ বা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নয়, সুদীর্ঘ কয়েক বছর ব্যাপী সময়ের কষ্টিপাথরে তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংঘাত এবং মিলন আর এস পি'র ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতার শর্ত নির্মাণ করেছিল সেদিন। সুদীর্ঘ আট দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সর্বগ্রাসী নয়াউদারবাদ যে ফ্যাসিবাদী আর্থরাজনৈতিক তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরে মানবতাধ্বংসকারী পথ গ্রহণ করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে অবিচল থেকেছে আর এস পি। তা সত্ত্বেও এটাই ইতিহাসের ট্র্যাজেডি যে এখনও পর্যন্ত খেটে খাওয়া মানুষের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিকল্পে শ্রমজীবী শ্রেণির সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে ওঠে নি। খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে দেশের কোটি কোটি শোষিত বঞ্চিত মানুষ। এই মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বৃহত্তর বামগণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলাই একমাত্র কাজ।

সংযুক্ত মোর্চাকে জেতাও, তৃণমূলকে তাড়াও, বিজেপিকে ভাগাও

৩-এর পাতার পর

লগ্নির জন্য নিরাপদ ভূমি নয়। অথচ, লগ্নি সরাবার ক্ষেত্রেও আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের বাধাবিঘ্ন আছে। কোনভাবে এ মুহূর্তে কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে—রাতারাতি ভারতের বিদেশি লগ্নির বেশিরবাগ ভারত থেকে সম্ভবত সরে যাবে। সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে অনেকেই। সেই সুযোগ—তারা তৈরি করতে চাইছে। কৃষক আন্দোলন থেকে যার সংযুক্ত কিষান মোর্চার নির্দেশ অমান্য করে ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লা অভিযান করেছিলেন, তাদের পেছনে এদের উস্কানি ছিল। তারা, সরলেও, এই ধরনের এনজিও এই আন্দোলনে আরও অনেকেই আছে। দীর্ঘস্থায়ী এই কৃষক আন্দোলনকে সফল করতে গেলে, এদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আম্বানি আদানিরাও মার্কিন বহুজাতিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে আজ কৃষি ও খাদ্যবাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে চাইছে। সেই পরিকাঠামো আদানিরা ১৯৮৬ সাল থেকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে। এর পেছনে, ভারতে, যে যখন সরকারে ছিল—সহায়তা করেছে। নরেন্দ্র মোদী করেছেন হাত খুলে। অথবা, এরা শেষপর্বে মোদীকে গদিতে বসিয়ে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়েছে। তিন কৃষি আইন এখন, বলতে গেলে, সেই লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। কিন্তু, কুড়িটি দেশকে নিয়ে গঠিত যে কেয়ার্ন গ্রুপ বিশ্বের কৃষি ও খাদ্যবাণিজ্য ও ইউরোপের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করে—তার নেতৃত্বে আছে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। আম্বানি ও আদানিদের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের কৃষি ও খাদ্যবাজারে প্রবেশ করলে এদের স্বার্থ নিশ্চিতভাব অনেকটাই ঘা খেতে বাধ্য। তাই এরা কৃষক আন্দোলনের প্রতি দরদে কুমির মায়ের মতো কাঁদছে। ভারতে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং আম্বানি ও আদানিদের বিরুদ্ধে কৃষক ও জনসাধারণের যুদ্ধে এই সব বিদেশি পুঁজির স্বার্থের অনুপ্রবেশ যাতে কোনওভাবেই না ঘটে—সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-